মা ও শিশুমৃত্যুরোধে অভূতপূর্ব অর্জন বাংলাদেশের

তন্ময় সরকার

বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ। এ দেশের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, শিশু ও মাতৃমৃত্যু ছিল উন্নতির অন্তরায়। কিন্তু সরকারের কিছু আন্তরিক চেষ্টা এবং এ ক্ষেত্রে নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীদের ঐকান্তিক শ্রমে সমাধান হচ্ছে এই সমস্যার। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাফল্য, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো, টিকাদান অভূতপূর্ব অর্জন- সবই সরকারের ও জনগণের কৃতিত্ব। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ যেসব সূচকে পিছিয়ে ছিল, ২০১০ সালের পর তা অনেকখানি এগিয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য হচ্ছে শিশুমৃত্যুর হার কামিয়ে আনা। শিশুমৃত্যুর হার কমানোর অর্জনে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২১ সেপ্টেম্বর ২০১০ জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেন। মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ এই সরকারের সাফল্যের মুকুটে অন্যতম পালক। ২০৩০-এর মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সার্বজনীনভাবে একগুচ্ছ সমন্বিত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এতে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠ (SDG) ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। টেকসই অভিষ্ঠের ৩.২ "২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও ৫ বছর বয়সের নীচে শিশুদের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুনাশ করা" এটি বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের। সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে তথ্য মন্ত্রণালয়ও দায়িত্ব পালন করছে। এক্ষেত্রে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ হলো– এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং করবে তা জনগণকে অবহিত করার মাধ্যমে সচেতন করা। এর মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ এবং অংশিদারিত্ব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সৃষ্টি হয়।

৫০ বছরে মা ও শিশু মৃত্যুহার কমেছে। মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। ধারাবাহিক সাফল্যে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে। ২০১৯ সালের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স অব বাংলাদেশের তথ্যমতে, ২০০৪ সালে প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুহার ছিলো ৩ দশমিক ২০ শতাংশ। বর্তমানে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৬৫ শতাংশ। এদিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মা ও শিশুমৃত্যুহার কমানোর কৌশলপত্রের তথ্যমতে, ২০০৯ সালে প্রতি লাখ সন্তান প্রসবে মাতৃমৃত্যুহার ছিলো ২৫৯ জন। সম্প্রতি সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ১৬৫ জনে। গত ১০ বছরে মাতৃমৃত্যুহার কমেছে প্রতি লাখ জীবিত জন্মে প্রায় ৯৪ জন। এদিকে শিশুমুত্যুরহার কমেছে ৮৫ শতাংশ। এই অর্জনে সরকারের কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ আছে। নবজাতক মৃত্যুর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে জন্মের সময় শ্বাস গ্রহণে সমস্যা ২৩ শতাংশ, কম ওজনের শিশু ২৮ শতাংশ, সংক্রমণ ৩৬ শতাংশ। কম জন্ম ওজনের শিশুকে পরিপূরক খাবারের ওপর জোর দিয়েছে সরকার। নবজাতকের শ্বাস গ্রহণে সমস্যা কমাতে 'হেল্পিং বেবিজ ব্রিদ' নামের একটি কর্মসূচি উপজেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে প্রতিটি হাসপাতালের শিশু বিভাগে চালু আছে। পাশাপাশি নবজাতক ইউনিটে ইনকিউবেটর ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি মজুদ আছে। সংক্রমণ কমাতে মা ও শিশুকে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় টিটেনাসের টিকা দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া কম জন্ম ওজনের শিশু যাতে মায়ের সংস্পর্শে তাপমাত্রা ও বুকের দুধ পায়, সে জন্য প্রতিটি উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে 'ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার' নামে একটি সেবা চালু হয়েছে। এই কর্মসূচিতে সহায়তা দিচ্ছে ইউনিসেফ। শিশুমৃত্যুহার হ্রাসে সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ অর্জন করেছে।

সুস্থ শিশুর জন্ম নিশ্চিতের লক্ষ্যে গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবপূর্ব (গর্ভকালীন), প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা প্রদান নিশ্চিতের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি গর্ভবতী মহিলাদের অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান এবং কোনো জটিলতা দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব প্রসূতিকে জরুরি প্রসূতিসেবা কেন্দ্রে প্রেরণ নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে এ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পরিচালনা করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতাভুক্ত গ্রামগুলোর মধ্যে থেকে মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে "কমিউনিটি গ্রুপ" তৈরি করা হয়। এই কমিউনিটি গ্রুপ কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ সমস্ত কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং ৩০ প্রকার ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে।

টিকাদানের মাধ্যমে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় এমন একটি সফল কর্মসূচির নাম হচ্ছে ইপিআই (সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি)। এই কর্মসূচির আওতায় ১০টি রোগের বিরুদ্ধে ছয়টি টিকা দেওয়া হয় ০ থেকে ২৩ মাস বয়সি শিশুদের। এ কর্মসূচিতে সহায়তা করছে গ্লোবাল অ্যালয়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন। এ কর্মসূচিতে যে রোগগুলোর টিকা দেওয়া হচ্ছে তা হলো-যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফিলাস ইনফলুয়েঞ্জা বি, হাম, রুবেলা, পোলিও ও নিউমোনিয়া। এ কর্মসূচির বর্তমান লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয়ভাবে টিকার হার ৯৫ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ। এছাড়া সরকার রোগ নির্মূল ও শিশুমৃত্যু রোধে নির্দিষ্ট সময় পর পর সম্পূরক টিকাদান কর্মসূচি করে থাকে। বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশে শতভাগ সফল কর্মসূচির নাম ইপিআই। এ সাফল্যের কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪ সালের মার্চে বাংলাদেশকে পোলিও নির্মূল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ভ্যাকসিন হিরো'র অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। পাশাপাশি এ কর্মসূচির আওতায় ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি প্রজননক্ষম নারীদেরও টিটি টিকার পাঁচটি ডোজ দেওয়া হচ্ছে।

২০১৯ সালের বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবিতজন্মে ১.৭৩, যা ১৯৯০ সালে প্রতি হাজার জীবিতজন্মে প্রায় ৬ ছিল। এই মাতৃমৃত্যুর হার কমে আসার পেছনে অনেকগুলো ধাপ আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত নিয়ম গর্ভকালীন ও প্রসবপরবর্তী সেবা কমপক্ষে চারবার নিতে হবে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতলগুলোতে জরুরি প্রসূতিসেবার লক্ষ্যে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যায় চিকিৎসকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা ইউনিসেফ ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের সহায়তায় সরকার পরিচালনা করে থাকে। মাতৃস্বাস্থ্যসেবা সবসময় চালু থাকছে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের কী কী করণীয় এবং তাদের পুষ্টি পরামর্শ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া সরকারি কেন্দ্রগুলোর একটি বড়ো কাজ।

গত ৫০ বছরে মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতিতে বাংলাদেশের অর্জন গুরুত্বপূর্ণ। শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। শূন্য থেকে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুরমৃত্যুহার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যকে ইতোমধ্যে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) স্বীকৃতি দিয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের টার্গেট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সরকারের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু প্রতি হাজারে ৫০ জনের নীচে নামিয়ে আনা। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে, ১৯৭২ সালে এক হাজার শিশু জন্ম নেয়ার পর বয়স এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে ১৪১টি শিশু মারা যেতো। আর এখন মারা যায় ২১টি শিশু। পাকিস্তানে এখন শিশুমৃত্যুর হার ৫৫। অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বছরে সংখ্যাটি ছিলো ১৩৯। পাকিস্তানের শিশুমৃত্যুর হার বাংলাদেশের চেয় কম ছিল। জনস্বাস্থ্যবিদরা বলছেন, স্বাধীনতার পর গত ৫০ বছরে দেশের প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য মিলেছে। এক্ষেত্রে মা ও শিশুমৃত্যুহার হ্রাসেও পিছিয়ে নেই। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভূমিকা রয়েছে দেশের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠকর্মীদের। তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা তৈরি, জরুরি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং পরামর্শ প্রদান। এছাড়াও স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি অগ্রগতি, নারী শিক্ষার প্রসার, নিরাপদ মাতৃত্ব গ্রহণ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও টেলিমেডিসিন সেবার প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক সন্তান জন্মদান, সন্তান প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, ডায়রিয়াজনিত রোগনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, পুষ্টি কর্মসূচি শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া কৃমিনাশক, ভিটামিন ‘এ’ কর্মসূচি শিশুদের অবস্থার উন্নতি করেছে।

দেশের সংবিধানে, বিভিন্ন সময়ে নেয়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যনীতি এবং সর্বশেষ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত কর্মসূচিতে এসব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়। গত ৫০ বছরে ধারাবাহিককভাবে এসব কাজ হয়ে এসেছে। তার ধারাবাহিকতায় এখনো প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তত্ত্বধানে একদল দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ফলে মা ও নবজাতকের সবসূচকে বাংলাদেশের উন্নতি ঘটছে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন বার্ষিক গ্লোবাল চাইল্ড হুড রিপোর্ট ২০১৯ শীর্ষক প্রতিবেদনে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালে গত দুই দশকে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। চারটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি অর্জন করেছে, যেখানে ভুটানের শিশু মৃত্যুহার কমেছে ৬০ শতাংশ, নেপালে ৫৯ শতাংশ এবং ভারতের ৫৭ শতাংশ। আর বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার কমিয়েছে ৬৩ শতাংশ। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ২৪ বছরে দেশে শিশুমৃত্যুহার ৭৩ শতাংশ কমেছে। এসডিজি অনুযায়ী, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে শূন্য থেকে এক মাস বয়সি শিশুমৃত্যুহার প্রতিহাজারে ১২ জনে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। বর্তমানে এই সংখ্যা ২৮ জন। তবে, শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুমৃত্যুহার প্রতিহাজারে ৩৮ জন। এদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ২০৩৫ সালের মধ্যে জীবিত জন্মানো শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ২০ জন নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, সরকার মাতৃ ও শিশু মৃত্যুরোধে সকল সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। আর এই কারণেই দেশে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু উভয়ই কমেছে। তিনি বলেন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আমাদের ২০৩০ সালের মধ্যে প্রিম্যাচুউরড এ শিশুমৃত্যুহারের লক্ষ্যমাত্রা ১২ দেওয়া আছে। স্বাস্থ্যসেবাখাতের সবাই সঠিকভাবে সঠিক কাজটি করলে এই অপরিণত শিশুমৃত্যুহারের লক্ষ্যমাত্রা আগামী দুই বছরেই অর্জন করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে দেশের সব সরকারি হাসপাতালেই গর্ভবতী মায়েদের জন্য ২৪ ঘণ্টা ডেলিভারি সুবিধাও রাখা হবে।

এর সবই বর্তমান সরকারের সাফল্যের গল্প। এতে অবদান রয়েছে গণমানুষের সহযোগী মনোভাবেরও। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে অনেক দূর।

#

৩০.০১.২০২২ পিআইডি ফিচার